নারীর ওপর ভাষিক আধিপত্য : প্রান্তে তার পালটা-ভাষা

বাধন অধিকারী

উৎসর্গ : কবি মণিকা রশিদ; আমার মণিকাদি,
সুদূর প্রবাস থেকে যাঁর দেশ-বিষাদের ছন্দ ভেসে আসে সাইবারস্পেসের মাধ্যমে, আমার একলা বিষণ্ন দিনে...

পটভূমি

ভাষাকে কেন্দ্র বিবেচনা করে, এর সাথে ভাবনা-প্রতীক-অর্থ-ক্ষমতা-জ্ঞান-আধিপত্যের সম্পর্কসূত্রকে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে, এই লেখার পটভূমি তৈরি হয়। ভাষা-সহযোগে নির্মিত আমাদের প্রতিদিনকার বাস্তব, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় প্রতিদিনকার ভাষিক বিনিময় আর সেই ভাষিক বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদিত চিন্তাধারা ও তৎপরতা, ক্ষমতাশক্তির অপরাপর ধারাগুলোর সাথে এই জ্ঞানের কিংবা চিন্তাধারার সম্পর্কসূত্র, আর তারই বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সহজাত ভাষা-ক্ষমতা, তার সৃজনশীল ভাষা তৈরির সক্ষমতা। এই ভাষিক-সক্ষমতার অসীম সম্ভাবনার কিনারে দাঁড়িয়ে খোদ ভাষা-কর্তৃক নারীর প্রতিদিনকার বাস্তবতা নির্মাণের পাঠ নিতে গিয়ে আরো অনেক কিছুর সাথে এটা দেখা হয়ে যায় যে, সমাজে প্রবহমান পুঁজি-প্রেষিত-পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার যে আধিপত্য, ভাষা খোদ সেই আধিপত্যের জমিনকে পোক্ত করতে থাকে তার নির্মিত অর্থ কিংবা নির্মিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অর্থাৎ খোদ ভাষাই হয়ে দাঁড়ায় পুরুষতন্ত্রের দাস, তার বৃত্তে বৃত্তাবদ্ধ। ভাবনা যেহেতু ভাষাকে প্রভাবিত করে, আর ভাষা যেহেতু জ্ঞান তৈরির প্রধান হাতিয়ার এবং সেই জ্ঞান মানেই যখন ক্ষমতা তখন পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোতে ভাষা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানেরই উৎপাদন ঘটায়। এই লেখা চলমান পুরুষতান্ত্রিকতার বিপরীতে পালটা ভাষিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করবার মাঝ দিয়ে পালটা ডিসকোর্স হাজির করবার বাসনাজাত।

ভূমিকা

হাজার হাজার বছরের জারিকৃত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা আর তার নিরিখে নির্মিত ভাষা-সংস্কৃতিকে এক প্রবন্ধে কিংবা একদিনে নয়, বরং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ পরিশ্রম দিয়েই কেবল মোকাবেলা করা সম্ভব। সেই কাজ যে একেবারেই শুরু হয় নি তা নয়। সেখানেই আমাদের আশা। সেখানেই আমাদের ভরসা। সেখানেই আমাদের দায়িত্বও। এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে খোদ ভাষার অভ্যন্তরে কী করে একটা পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বাস করে আর কীভাবে তা নারীর ওপর আরোপিত হয় তা আলাপ করব দু'চারটা উদাহরণসমেত। সেই আলাপে ভাষার মাধ্যমে উৎপাদিত জ্ঞানে নারীর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটছে, সেটাকে আমরা চিনতে চেষ্টা করব এবং পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতাকে চলমান রাখতে খোদ ভাষাই কীভাবে একটা মুখ্য শক্তি হয়ে ওঠে তা দেখব। এরপর আমরা পালটা বাস্তবতার সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনা নিয়ে খানিকটা আলাপ করব আমাদের আশপাশের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে।

বেশ্যা-পতিতা-ছিনাল-খানকি : নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ!

বেশ্যা শব্দটি এসেছে বৈশ্য শব্দ থেকে। বর্ণপ্রথার কালে হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণিকে বলা হতো বৈশ্য। সেখান থেকে বিকোনো অর্থে এসেছে বাংলা বেশ্যা শব্দটি। কালের পরিক্রমায় শব্দটির একক-একমুখী অর্থ নির্মিত হয়েছে। শরীর বিক্রি করা মেয়েদের উপাধি হয়েছে বেশ্যা শব্দটি। সে যাই হোক, শুধু শরীর বিকোলেই না, সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করলে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিলে, রাতবিরেতে ঘোরাফেরা করলেও বেশ্যা বলার চল আছে। বেশ্যা একটি স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এর কোনো পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ নেই। তার মানে কি এই যে, শরীরী শুদ্ধতা কেবল নারীদেরই বিষয়? পুরুষের শরীরকে শুদ্ধ হতে হয় না? পুরুষের শরীর বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য হতে পারে না? একই রকমের শব্দ ছিনাল/ছিনার। অভিধানে এগুলোর অর্থ করা আছে পতিতা, ভ্রষ্টা, কুলটা, ব্যভিচারিণী, মিথ্যা প্রণয়, মান অভিনয় ইত্যাদিতে কলাকুশলী নারী। খানকি শব্দের আভিধানিক অর্থ বারাঙ্গনা, বেশ্যা। পতিতা শব্দের অর্থ করা আছে বেশ্যা, বনিতা, বারবনিতা। এই শব্দগুলোর কোনোটিরই কোনো পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ নেই।

ভাত দেয়া ভাতার আর পুঁজিতান্ত্রিক দাস নারী

ভাতার শব্দের সরাসরি অর্থ করা আছে স্বামী, পতি এই দুটি শব্দ। এছাড়া ভরণ করায় যে, ভর্ত বা ভাত দেয় যে সেও ভাতার। আমাদের প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারী মধ্যবিত্তের বাঙালি সংস্কৃতিতে ভাতার শব্দটির তেমন প্রচলন না থাকলেও নিম্নবিত্তের যাপনক্রিয়ার সাথে ভাতার শব্দটির এখনো ওতপ্রোত বসবাস। মধ্যবিত্ত নারীর ভাত কিংবা ভরণপোষণ এই যুগে এসে আর আগের মতো করে পতি কিংবা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নেই। অনেকেই এখন কর্মক্ষেত্রে যান এবং ইচ্ছে করলেই পুঁজিতন্ত্রের আওতায় স্বনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনযাপনে সক্ষম। কিন্তু নিম্নবিত্তের নারীরা ঘরেই থাকেন বিশেষত। প্রতিদিন গৃহস্থালি নামের শব্দের মধ্যে একটু একটু করে হারিয়ে যেতে থাকে তাঁদের শ্রমিকতার ইতিহাস, হারিয়ে যেতে থাকে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাঁদের বিনিয়োজিত শ্রমের মূল্য পাবার প্রশ্ন। স্বয়ং কার্ল মার্কসও টের পান না। তাই পুরুষ এখনো নিম্নবিত্তের ভাতার। সবমিলিয়ে পুরুষ-পুঁজি আর পুরুষ-স্বামীর মিলিত প্রয়াসে ভাতার শব্দটি অভিধানস্বীকৃত হয়। নিম্নবিত্তের যে নারীরা গৃহস্থালির বাইরে ইট ভাঙেন, গার্মেন্টসে কাজ করেন, অন্যের বাড়িতে দাসীর কাজ করেন, তাঁদেরও হায় তবু পুরুষ ভাতার।

সতীত্বের চিহ্ন : সতীত্বের পুরুষ-ভাষা

প্রথমে অভিধান থেকে কিছু শব্দের অর্থ আমরা জেনে নিতে পারি। বাংলা একাডেমীর অভিধানে এভাবে অর্থগুলো করা— সতী : সাধ্বী, পবিত্র, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্ত নয় এমন, হিন্দু পুরাণের দক্ষ কন্যা, শিবানী, স্বামীর মৃত্যুতে সহগামিনী স্ত্রী। সতিচ্ছদ : কুমারী ঝিল্লি, যোনিমুখের পাতলা পর্দা। সতীত্ব : যৌন পবিত্রতা, সতী স্ত্রীর ধর্ম। সতীধর্ম : স্বামীর প্রতি নারীর একনিষ্ঠতা বা যৌন পবিত্রতা। সতীপনা/সতীগিরি : সতীত্বের ভুয়া গর্ব বা মিথ্যা ভড়ং।

সতীত্ব তাহলে শুধুই নারীর বিষয়। সতীত্ব হলো যৌন পবিত্রতা, সোজা বাংলায় বললে একগামিতা, যা কেবল নারীর জন্যই অভিধানসিদ্ধ। কেননা পুরুষের জন্য সতীত্বের সমার্থক শব্দ আমি অন্তত ডিকশনারিতে খুঁজে পাই নি।

চুত, চুতমারানি, চুদ, চুদা : নারীর ওপর ভাষিক-সহিংসতা

অভিধানে চুত শব্দের অর্থ করা আছে যোনি। চুতমারানি : যত্রতত্র যৌনসঙ্গম করে এমন। চুদ : যৌনসঙ্গম। পাঠক খেয়াল করে দেখুন, চুদ শব্দের সমার্থক হিসেবে যৌনসঙ্গমের কথা বলা থাকলেও চুদা শব্দের সাথে একেবারে কর্তাসত্তা হিসেবে পুরুষের ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে। সেই একমাত্র সক্রিয়ক হয়ে দাঁড়ায়। কোনো মেয়ে বলে না যে, চুদব। কেন বলে না? কেননা চুদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যৌনসঙ্গম হলেও অর্থের জগতে এখানে পুরুষেরই একক আধিপত্য। চুত শব্দের অর্থ যোনি। যৌন শব্দটিও 'যোনী' থেকেই এসেছে। যোনিগত, যোনিজাত যা তাই যৌন। কিন্তু যৌনতা শুধুই নারীর যোনিতে থাকে, পুরুষ তাতে সাড়া দেয়, তার মানে কী দাঁড়ায়? আবারো নারীর অক্রিয় ভূমিকা। তার প্যাসিভ রোল। যৌনতায় তাঁর নিষ্ক্রিয়তা। [বলে রাখাটা অত্যন্ত সংগত হবে যে, ভারতের একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক, কলিম খান, যোনী-যৌনতার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বের করেছেন, যা যৌন শব্দের একক অর্থকে অস্বীকার করেছে। সে অর্থে তিনি ভাষায় পুরুষাধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে লড়াইয়ে আছেন।] এমনি করে 'গোয়া মারব', 'চুদব', এমনকি 'খাব' শব্দগুলোর মতো অনেক অনেক শব্দ দিয়ে এই ভাষিক সহিংসতা জারি রাখা হয়, যেখানে নারী বিবেচিত হয় পুরুষের যৌনভাবনা কিংবা যৌনক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে। যৌনতায় নারীর সক্রিয়তা থেকে তাকে বিযুক্ত রাখা হয়। শব্দগুলো নারীর ওপর যৌনপীড়নের প্রতীককে পরিণত হয়। যৌনতা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের সক্রিয়তার এলাকা, নারী তাতে শুধুই নিপীড়িত, শুধুই অনুষঙ্গ।

ধর্ষণ : নারীর ওপর শারীরিক সহিংসতা

প্রথমে অভিধান থেকে অর্থ জেনে নিই। ধর্ষণ শব্দের অর্থ করা আছে পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন। বলাৎকার, বলপূর্বক গ্রহণ। ধর্ষিত শব্দের অর্থ করা আছে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, পরাভূত, পরাজিত, অপমানিত, তিরস্কৃত আর ধর্ষিতা শব্দের অর্থ বলাৎকৃতা, বলপূর্বক সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছে এমন। আবারো সেই একইভাবে দেখুন পাঠক, ধর্ষণ শব্দের অর্থ হিসেবে পীড়ন অত্যাচার নির্যাতন ও বলপূর্বক গ্রহণের কথা বলা থাকলেও ধর্ষণী নামের একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যার মানে করা আছে অসতী নারী। তার মানে আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক ভাষার জগতে কেউ ধর্ষণের শিকার হলে

কাউকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে তার সতীত্ব চলে যায়। ওদিকে আরেকটি শব্দ পাওয়া গেল ধর্ষণীয়, যার অর্থ ধর্ষণযোগ্য, ধর্ষণসাধ্য, নির্যাতন বা দলন করতে পারা যায় এমন। তার মানে ধর্ষণযোগ্য কিংবা ধর্ষণসাধ্য বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহলে আমাদের এটা মেনে নিতে হয় যে, খোদ অভিধান ধর্ষণকে অনুমোদন করে ধর্ষণযোগ্য কিংবা ধর্ষণসাধ্য কোনোকিছুর অস্তিত্ব রেখে! হায়রে সতীত্ব! হায়! এখানে ধর্ষিত শব্দের অর্থ হিসেবে কোথাও সতীত্বের প্রশ্নটি না তোলা হলেও ধর্ষিতা বলতে সেই মেয়েটির কথাই বলা হয়েছে, যার সতীত্ব হরণ করা হয়েছে বলপূর্বক। তার মানে নারীর সতীত্ব তার নিজের কাছে না, সতীত্ব বন্দি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কাছে। জোর করেই কাউকে ধর্ষণ করবে পুরুষ আর নাম দেবে অসতী। নারীকে গ্রহণ করতে হবে সেই উপাধি।

লিঙ্গান্তরে অর্থান্তর : সতী, নটী, মাগী

লিঙ্গান্তরে অর্থেরও বদল ঘটেছে কিছু কিছু শব্দে। এই যেমন সতীর পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ সৎ হলেও সৎ শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে শরীরগত সততা, তথা সোজা বাংলায় বদলে একগামিতার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি করে নটী শব্দের অর্থ হিসেবে নর্তকী, নৃত্য যে নারীর উপজীবিকা, অভিনেত্রী এইসব শব্দের কথা বলা আছে। কিন্তু নট শব্দটি অভিধানে থাকলেও বাইরে প্রচলন নেই। কিন্তু বেশ্যা, শরীরী, প্রণয়ী নারী অর্থে নটী শব্দের প্রচলন আছে বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে। মাগী শব্দের অর্থ করা আছে প্রাপ্তবয়স্কা, স্ত্রীলোক, সাবালিকা নারী, বেশ্যা, গণিকা। কিন্তু মরদ মানে বেটাছেলে, যে ব্যক্তির পুরুষোচিত গুণ রয়েছে, শক্তিশালী ব্যক্তি, বীরপুরুষ, যুবক, পতি, স্বামী। পাঠক খেয়াল করে দেখুন, মাগী শব্দের সাথে বেশ্যা গণিকা শব্দের সমার্থ করা থাকলেও এর পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ মরদ-এর সাথে শারীরিক বেচাকেনার কোনো সম্পর্ক নেই। তার মানে, ছেনাল-বেশ্যা শব্দের মতো এই শব্দগুলোর অভ্যন্তরেও সেই একই ধারণা জারি আছে যে, একগামিতা, শারীরিক শুদ্ধতা, সতীত্ব এইসব শুধুই নারীর বিষয়। মানে নারী একগামী থাকবে, অনেকের সাথে শারীরিক সম্পর্ক থাকবে না, পুরুষ তাকে এই পুরুষতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী মালিকানার যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করবে, ভোগ করবে কিনে নেয়া সম্পত্তির মতো।

ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির লৈঙ্গিক অভিপ্রকাশ : আমারই পুর্বপুরুষ!

পুঁজিতান্ত্রিক-ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে পূর্বপুরুষ নামের একটি শব্দ থাকলেও পূর্বনারী বলে অভিধানে কোনো শব্দ নেই। পূর্বপুরুষ শব্দটির আভিধানিক অর্থ বংশের পিতৃপিতামহাদি পূর্বগামী ব্যক্তিগণ। ওদিকে পুরুষানুক্রম নামে একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অভিধানে, যার অর্থ বংশপরম্পরা। তার মানে আমাদের পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি যে সম্পদের ধারণা জারি রেখেছে, সেখানে নারীও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এখানে ভয়ঙ্করভাবে দৃশ্যমান হয় এই সত্য যে, ১০ মাস নারীর নিজের শরীরের মধ্যে আরেকটি শরীরকে একটু একটু করে বাড়িয়ে তোলা এবং অধিকাংশ দায়দায়িত্ব পালন করার পরও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে প্রথম অনুভূতির বিনিময় যে শিশুর, সে শিশুর পূর্বনারী নেই, সে শিশুর নেই কোনো নারীক্রম! সে শিশু কেবলই পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত। পাঠক, এই পূর্বপুরুষ আমাদের অস্বীকার প্রক্রিয়ার এক নাম। অবদমনের এক নাম। নারীর ওপর পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যে আধিপত্য; এই পূর্বপুরুষ শব্দটি তারই প্রতিমা। একগামী নারীর জন্য, বংশপরিচয়ের নিমিত্তে, পুরুষের আইডেনটিটি বজায় রাখতেই এই প্রক্রিয়া। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য আর নারীর জন্য কাল-নির্ধারিত একগামিতার ধারণা মিলেমিশে তৈরি করে পূর্বপুরুষ।

শালা কখন গালি? কখন বন্ধু 'মামা'?

শালা শব্দের আভিধানিক অর্থ পাচ্ছি দুটি— স্ত্রীর ভাই, গালিবিশেষ। স্ত্রীর ভাই আর গালি একই শব্দে প্রকাশিত। সামাজিক অর্থনির্মাণ প্রক্রিয়ায় একেবারে তুচ্ছার্থে গালি অর্থে এই শালা শব্দটির ব্যবহার এবং স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কসূত্র পুরুষাধিপত্যের ভয়ঙ্কর নমুনা। স্ত্রীর ভাই, শালা, একেবারে তুচ্ছ, হাস্যরসের উপাদান ইত্যাদি। এমনি করে তরুণ প্রজন্মের একটি অংশের মধ্যে বন্ধুদের পরস্পরকে আর শালা নয়, মামা নামে ডাকা হচ্ছে। শব্দটি কিন্তু শালার বিপরীতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং এখানেও ব্যাপারটা হলো বাপের শালা বলে উপহাস করা। আমরা টেরই পাই না, এভাবে গোপনে কখন পুরুষাধিপত্যশীল শব্দ আমাদের মধ্যে ঢুকে যায়।

মেয়েলি মানে কী? পুরুষালি মানে কী?

অভিধানে মেয়েলি আর পুরুষালি শব্দের অর্থের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক অর্থনির্মাণে মেয়েলি শব্দটি দিয়ে মেয়েদের আবেগী, যুক্তিহীন, কোমলপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য জানান দেয়া হয়, অপরদিকে পুরুষালি শব্দটি দিয়ে পৌরুষ, শক্তি, ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এখানেই ভাষার রাজনীতি। তার মানে মেয়েরা আবেগ নিয়ে থাকবে, কোমল হবে, কোনো উলটাপালটা করবে না, পুরুষত্বসম্পন্ন পুরুষের অধীনস্থ থাকবে। এই হলো সোজা বাংলা কথা। তাই আমরা যখন দেখি কোনো ছেলে কোমল আচরণ করছে কিংবা তেমন কিছু করছে তখন তার স্বভাবকে মেয়েলি স্বভাব বলে উপহাস করা হয়। আবার অপরদিকে মেয়েরা যদি বাইরে চলাফেরা করে, তর্ক করে, জোরে হাঁটে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে, তখন তার স্বভাবকে পুরুষালি স্বভাব বলে গালি দেয়া হয়।

নপুংসক : পুরুষেরই গালি

নপুংসক শব্দটিও পুরুষাধিপত্যমূলক অর্থ বহন করে। নপুংসক শব্দটির মানে করা আছে ক্লীব, হিজড়া, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয় এমন মানুষ, ছিন্নমুষ্ক, খোজা, পুরুষত্বহীন, বীর্যহীন, কাপুরুষ, পৌরুষের অভাব, ব্যক্তিত্বহীন। অর্থাৎ দেখুন পাঠক, পুরুষত্বহীনতা, বীর্যহীনতা আর যৌনসক্ষমতা থাকা না থাকা একই শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পৌরুষের অভাব কিংবা পুরুষত্বহীন— এই দুটি শব্দকেও যখন নপুংসক-এর সমার্থক বিবেচনা করা হয়, তখন এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া আমাদের বুঝতে শেখায়, আসলে মনুষ্য প্রজাতির সমগ্র থেকে সমস্ত পুরুষ আলাদা এই অর্থে যে তার যৌনক্ষমতা নারী-হিজড়া সবার থেকে আলাদা, অনন্য। এই শ্রেষ্ঠত্বের বোধ এই অধিপতি মন আর অধিপতি পুরুষভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গৃহিণীপনা : ভাষা যখন গৃহকর্মে নারীর একক দায়িত্বকে প্রশ্নাতীত করে

গৃহিণীপনা শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে পুরুষের কোনো যোগাযোগ নেই। আবার গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত পুরুষকে প্রকাশ করতে অর্থপূর্ণ কেনো শব্দের হদিসও অভিধানে পাওয়া যায় নি, আমি অন্তত পাই নি। তার মানে পাঠক, গৃহস্থালির কাজকে নারীর একক কাজ বলে বিবেচনা করা হয় বলেই গৃহিণীপনার মতো শব্দগুলো অভিধানে থেকে যায়। যা প্রশ্নাতীত করে এই পুরুষতান্ত্রিক-বাস্তবতা যে, গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব একান্তই নারীর। পুরুষের না। আর এমনি করে নারীকে গৃহবন্দি রাখবার বাস্তবতা প্রবহমান থাকে। যদিও মেয়েরা এখন বাইরে যায়, কাজ করে, তবু গৃহস্থালির একক দায়িত্ব থেকে তার মুক্তি ঘটবার নজির আমাদের চেখের সামনে আসে না বললেই চলে।

মানেটা দাঁড়াল কী? আমরা যতগুলো শব্দের মানে দেখেছি এবং বিশ্লেষণ করেছি তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভাষার গড়নটা পুরুষতান্ত্রিক, পুঁজিপ্রেষিত পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান-ক্ষমতা-সম্পর্কের কারণে। প্রাক-পুঁজিবাদী দাস নারীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে। পুঁজিবাদ সস্তাশ্রমের লোভে অন্দরের নারীকে বের করে বানিয়েছে গার্মেন্টসের শ্রমিক। শুধু রাজার অন্দরের নর্তকীকেই নয়, আরো অনেক মেয়েকে পরিণত করেছে পুরুষতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষিতায়। যে পুরুষতান্ত্রিক ভাষিক আধিপত্য ছিনালপনা আর সতীত্বের মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিয়ে সম্ভ্রমের ফ্রেমে নারীকে বন্দি রাখে, তাকে ভোগ্য বানায়, তাকে পুঁজিবাদী পুরুষ আর পণ্যের মডেল বানায় (এই যুগ নারীকে শুধু পণ্যের নয়, খোদ পুরুষতন্ত্রেরই মডেল বানিয়ে ছাড়ে। নেশা নয়, কেবল ছেলেরা খায় বলে সিগারেট খাওয়াটা জরুরি হয়ে ওঠে মেয়েদের জন্য, যখন স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা সৌন্দর্য নয়, কেবল ছেলেদের পোশাক বলে জিন্স আর ফতুয়া মেয়েদের পোশাক হয়ে যায়, তখন নারী খোদ পুরুষতন্ত্রেরই মডেল হয়ে যায়), সেই একই পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যই তার সম্ভ্রমহানি ঘটায়। তার ওড়না টেনে নেয়, তাকে ধর্ষণ করে, তার মুখে অ্যাসিড ছুড়ে দেয়। সঙ্গমের নামে তাকে পীড়ন করতে থাকে। তার মানে পাঠক, নারীর ওপর বলপ্রয়োগের শর্তগুলো সেই ভাষার মাধ্যমেই জারি রাখা আছে, যে ভাষা তাকে সতীত্ব আর সম্ভ্রমের ফ্রেমে বেঁধে রেখেছে। সম্ভ্রম আছে বলেই 'শ্লীলতাহানি' আছে, ধর্ষণ আছে বলেই আছে 'ধর্ষণযোগ্য'। সতীত্ব আছে বলেই আছে বেশ্যার একমুখী অর্থের অস্তিত্ব। পুরুষতন্ত্র নারীকে তার যৌনতার স্বাধীনতা, তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি, তার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, কবিতা লেখা কিংবা অন্য যেকোনো সাংস্কৃতিক তৎপরতার স্বাধীনতা থেকে দূরে রেখে তার ওপর যে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে আমাদের

ভাষা তারই বাহন। এই ভাষার মধ্যে জারি থাকা পুরুষতান্ত্রিক-সংস্কৃতির চিহ্নগুলো আস্তে আস্তে মুছে ফেলতে না পারলে আমাদের পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ শুধু লৈঙ্গিক-ভিন্নতার কারণে তাদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে। ক্ষুণ্ন হতে থাকবে তাদের শারীরিক-মানসিক প্রতিটি চাহিদা, প্রতিটি মানবিক প্রাপ্তির অধিকার। তারপর যৌনতাকে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুরুষেরা খেয়ে ফেলবে ভাষায় ও বাস্তবে। ভাষা পুরুষ দিয়ে নারী চোদাবে বাক্যে-ভাবনায়-সাহিত্যে-সংগীতে, আর পুরুষতান্ত্রিক মালিকানার ক্ষমতাবৃত্ত তার সফল বাস্তবায়ন ঘটাবে কাজে। পূর্বপুরুষ শব্দের মধ্যে আড়াল করবে মনুষ্যপ্রজাতির হয়ে ওঠবার অনন্য ইতিহাস। 'গৃহস্থালি' নামের ভাষা আড়াল করবে তার অর্থনৈতিক অবদান, অর্থশাস্ত্রের বাইরে থেকে যাবে রাজনীতি। রাজনীতিতে জিয়া-মুজিবের পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রতীক দুই উপাধি দেখেছেন পাঠক। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নামের আগে শেখ এবং নামের শেষে ওয়াজেদ নিয়ে তারপর ক্ষমতায় আসেন। বাপ-স্বামী দুজন। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার দুই মূর্ত প্রতীক। তারেকের নামের শেষাংশ জিয়া তুলে দিয়ে তাঁকে তারেক রহমান বানানোর দৃশ্যমান কারণটিও কি ওই পুরুষতান্ত্রিক প্রতীককে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা নয়? পাঠক খেয়াল করে দেখবেন কি, রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের সময় খালেদা-পুত্র তারেক জিয়া নামে মিডিয়ায় এবং ব্যক্তিগত আলাপে আলোচিত হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি বনে যান তারেক রহমান। এর ভিতরে কি এই রাজনীতি ছিল যে খালেদা জিয়ার নামের শেষাংশ থেকে জিয়া নিলে মাতৃকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়? কিন্তু হায়রে পুরুষতন্ত্র! খেয়াল করতে তার বাকি থেকে যায়, জিয়া-পত্নীও জিয়ার নামকেই বিবেচনা করেছেন। হয়েছেন খালেদা জিয়া!

আমাদের সমাজতত্ত্বও নতুন ভাষা খুঁজে বের করুক। নৃ-বিজ্ঞানের মাঠে মাতৃতান্ত্রিকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা জোরালো হয়েছে। প্রতিবেশ নারীবাদীরা নারীর ওপর আধিপত্যের সাথে প্রকৃতির ওপর আধিপত্যকে মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছেন। নারীবাদের জমিনেও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন সংকল্প। সংকল্প তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে। করপোরেট মিডিয়ার পুরুষতান্ত্রিক চরিত্র তার ভাষায় (এখনকার পত্রিকাগুলোর কেউ কেউ ঘোষণা দিয়ে জেন্ডার কনশাসনেস জারি রাখবার কথা বলে, সেটা মনে রেখে এবং পরীক্ষা করে দেখেও জোরালোভাবে চ্যালেঞ্জ রেখে বলছি) এবং প্রতীকে এবং অর্থনির্মাণে, সর্বোপরি রিপ্রেজেন্টেশনে প্রবলভাবে বহাল থাকলেও নয়া যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের সামনে এনেছে নতুন দিনের ইশারা। আমি ফেসবুকের কথা বলছি। ব্লগের কথা বলছি। বলছি অপরাপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কথা। পুঁজির উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে বাজার-বিজ্ঞাপনের স্বার্থে গড়ে উঠলেও এইসব মিডিয়া হয়ে উঠেছে প্রতিরোধী মানুষের মিলিত হবার, প্রকাশিত হবার এককেটা অনন্য মাধ্যম। অ্যাকসেস করতে পুঁজির খবরদারি মানতে হয় না বলেই এখানে জুটে গেছে যত্তসব প্রতিরোধী মানুষ। জানিয়ে দিচ্ছে তাদের অধিকারের কথা। আর তাই মহিলা কবির অপবাদ ঘুচিয়ে প্রবলভাবে দেখছে মেয়েরা কবিতা লিখছে। এটাই একমাত্র প্রতিরোধ নয়। আমি বলছি একটি সাইনের কথা। হুম পাঠক, মেয়েরা কবিতা লিখতে শুরু করলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে এমন একটা অনুমান আমার হয়েছিল বহু আগেই। আজ দেখতে পাচ্ছি, ছোট পরিসরে হলেও সেটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। অগ্রজ বন্ধু ফাতেমা শুভ্রা লিখেছেন :

'আমার শরীরের অনেক অঙ্গ/ প্রায়ই হারিয়ে যায়/ কেউ কেউ ফিরে আসে/ কেউ আসে না.../ সেদিন বনের কাঠ কুড়োতে/ যে মেয়েগুলো গেলো.../ ফিরে এসে বলে আমায়,/ আমার যোনীকে তারা/ হলুদ প্রজাপতি হয়ে/ উড়ে যেতে দেখেছে।

...কবিতা শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করে.../ "আচ্ছা কবিতা এতো শরীরি কেন?"

"কেন হবে না/ আমাদের শরীর নিয়েই তো চলে বেশ মাতামাতি.../ চিকিৎসা বিজ্ঞানের রয়েছে আমাদের শরীর নিয়ে আলাদা ক্ষেত্র.../ গাইনোকলজি..."

বন্ধুমানুষ প্রশ্ন করে... "এর চাইতে ভিন্ন ভাষা তৈরি করতে পেরেছো কী?"

হলুদ প্রজাপতির মতো উত্তর দেই/ "মনে হয় পেরেছি, মানুষ আমাদের এখন অশ্লীল বলে!"' [হলুদ প্রজাপতি...]

ফাতেমা শুভ্রা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান-ক্ষমতা-ডিসকোর্সে নির্মিত বাংলা কবিতার শরীরে এক ভয়ঙ্কর আঘাত হেনে দিলেন। কবিতার অনুষঙ্গ থেকে নারী হয়ে উঠল কবিতার কর্তাসত্তা। এমন দুর্দান্ত আবির্ভাব আরো লক্ষ করেছি মণিকা রশিদের কবিতায়। মণিকাদির দেশ-বিষাদ বেদনা-প্রেম-একাকিত্ব-স্বপ্ন একান্তই নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে আমার কাছে আসে সাইবারস্পেসের মুক্ত জমিনে ভেসে ভেসে। নারীর নিজস্বতা, তার একান্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় মণিকার কবিতায়। লিখে ফেলেছেন মণিকা রশিদ :

"কোজাগরী পূর্ণিমায়/ ঠাকুমা বিষাদ মুখ বেয়ে/ শব্দ ঝড় নেমেছিল—, 'এ দেখি আবারও এক মেয়ে!'

আতুর বেড়ার ফাঁকে/ বাবার চিবুকে চোরা সুখ—/ 'মেয়ে দেখি চন্দ্রাবতী—! তোমার মুখের মতো মুখ!'

বড় হও বেড়ে ওঠো/ অবহেলা সয়ে নিতে শেখো।/ একদা আকাশে চুল— পা দুখানি কাদাজলে মেখো।

মাটিরে আদর দিয়ে/ বর্ষা জলে বেঁধে নিও বীজ/ অংকুরের সময় এলে— সে কিশোর ছিঁড়বে কামিজ

শাড়ি নিও, শাড়ি দিয়ে/ ঢেকে রেখো শরীর, সে মন/ পাছে পুঁথি জেনে যায়— আড়ালের সে কী আয়োজন!

আড়ালেই গল্প রেখো/ তা না হলে জানবে সে ছেলে,/ এমন অপাঠ্য তুমি— আলো উড়ে যায় ডানা মেলে!

আলো গেলে রাত আসে,/ রাত এলে আত্মপরিচয়/ আত্মাকে নির্লিপ্ত করে— একবাটি বেদনা শুধায়!" [চন্দ্রাবতী (১ম পর্ব)]

ওদিকে আরেক প্রবাসী কবি চিমটি খান, মুগ্ধ করে দিয়েছেন ভিন্ন ভাষার শক্তিতে। আপন মহিমায় ভাস্বর এই তরুণ কবির প্রতি লাল সেলাম। শুনুন তাঁর একান্ত ভাষ্য :

"সুখে সুখে আর একবার স্বপ্নের চাবি ভাঙলাম/ দেহ থেকে কঙ্কাল মোমের মতো গলে গলে/ উড়ে উড়ে জেনে গেল আলোকবর্ষ দূর কষ্ট/ আমি জানলাম...

আমার মিথ্যা শীৎকার শুনতে চেয়ে চিৎকার করে গেল/ রাক্ষুসী অন্ধকার, বাতাস পাশ ফিরে কি সুন্দর নির্জন—/ পাখিরা জোৎস্নায় পালক ডুবিয়ে ঘুমাচ্ছো?/ আসো দেয়াশলাইয়ের কাঠিতে চুমু খাই, একটু/ কমলা লিপিস্টিক মেখে মেখে ঝরাপাতায়/ আগুন জ্বালাই...

ইলিশের নাভীতে মানুষের লালা ধূর্ত সঙ্গম শেখায়/ ভুলে যায় জ্যোৎস্নায় চুমুর জোয়ার/ মানুষের কাছে এসে মাছেরাও/ সঙ্গমের সুখ আর মেঘের কৌটায় তুলে রাখে না

উদভ্রান্ত লালশাক গৃহিণীর কাটা আঙুলের দিকে তাকিয়ে/ রক্তের রঙ নিয়ে ভাবতে ভাবতে রক্ত হয়ে যায়/ ভুলের পোকামাকড় খুব ভালো বোঝে শিকড় আসলে/ নান্দনিক কিছু বিন্যাস, জীবনের কেউ নয়

তারপরও আবার খুব নিজস্ব রাত্রি কাছে এলে/ শাড়ির সঙ্গে আড়ি পেতে প্রিয় অন্ধকার আমি গ য়ে জড়াবো/ সুখের ব্যাক্টেরিয়ার কানে কানে বলে দেব আমি আসক্ত.../ পতনোন্মুখ প্রেম, আমাকে উজাড় করো" [পতনোন্মুখ]

বন্ধু তানজিনা ফেরদৌস তাইসিন লিখেছেন ব্যাকুল বন্ধুবিষাদ। পিতৃতন্ত্র-মালিকানা-সম্পর্কের এক সহজ সমীকরণ খুবই জোরালোভাবে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। লিখেছেন তানজিনা :

"ও মেয়ে! তোর বন্ধু বুঝি হয়?/ বেশ তো ছেলে, চালতা পেরে দেয়!/ এ্যাত্তো মায়া কই থেকে ওর আসে?/ ওই ছেলেটা বড্ড ভালোবাসে!/ তোর দুখেতে আকুল হয়ে কাঁদে,/ লাল ঘুড়ি আর নীলচে চুড়ি সাধে।/ তোর সুখেতে নিখাদ খুশি হয়,/ ও আছে তো! তোর কীসের আর ভয়?/ ও ছেলে খুব বন্ধু বুঝি তোর?/ দু'জন তোরা ঠিক যে মানিকজোড়!/ সে তো আমার বন্ধু নাইকো আর!/ বন্ধু না থাক, শত্রু চমৎকার.../ কী ছাই বলিস, সেও কখনও হয়?/ বন্ধু না থাক, শুভার্থী নিশ্চয়!/ শুভার্থী না, সত্যি শত্রু হয়!/ আমার সকল অনিষ্ট সে চায়।/ কেমন করে এমন হলো বল?/ প্রাণের সখা কেমনে হয় রে খল?/ 'পুরুষ' যখন বন্ধু হতেও যায়/ বন্ধু যাহোক, 'পুরুষ' বেশি রয়,/ সে বন্ধুত্ব এমনি করেই বাড়ে/

নারীর উপর ‘পুরুষ অধিকারে’ ।/ যেটুক সময় নিজস্ব সম্পদ/ সে সময়ই থাকবে মহব্বত ।/ একটু যদি পান থেকে চুন খসে—/ কিংবা হয়তো নেই তুমি তার বশে,/ সেই সময়ই দেখবে আসল রূপ,/ সে কিছুতেই থাকবে না নিশ্চুপ ।/ এমন কাণ্ড ‘পুরুষ’ হলেই ঘটে/ দেখবে কতো নিন্দা মন্দ জোটে ।/ ‘পুরুষ’ বাবা-প্রেমিক-স্বামীর মতো/ ঘেন্না করি ‘পুরুষ’ বন্ধু যতো ।” [ব্যাকুল বন্ধুবিষাদ]

মাহি ফ্লোরা লিখলেন :

“ধারাবাহিক কান্নায় উত্তাল নগর যদি চায়, এখনি তুমি নিষ্ঠুর নীরবতায় ভিজবে.../ বাসি বৃষ্টির দাগ মুছে পেন্সিল কাঠের নিদাঘ ভুলো ফার্নিচারে হাত-পা ছড়িয়ে যদি থাকো,/ তবে ভালোবাসতেও পারি.../ যতটা ভালোবেসে রচিত হয় মহাকাব্য, মিথলজির আত্মা.../ গুনগুন কান্নায় অন্ধের অক্ষর খুঁজে ফেরে জেটি,/ থামতে হবে, নামতে হবে.../ বড় বেশি পরিষ্কার সমাধান.../ পৃথিবীর সব জীব সঙ্গম চায়, ভবিষ্যতে অতীত আনতে!/ এত ভাবছো বলেই, ভালোবাসতেও পারি ।/ যতটা ভালোবেসে জরায়ু ভরে যায় পৃথিবীতে আরেকজন তুমির বীজে!/ জন্ম হয় নতুন তুমির...”

কবিতার পুরুষতান্ত্রিক ডিসকোর্সকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন এঁরা । ‘ডাকিনি’ ‘বাঘিনি’, ‘সুন্দরী’, ‘রাক্ষসী’রা এবার নিজেই কবিতা লিখতে শুরু করেছে । পুরুষের কাছে ধার করে নয়, একেবারে নিজের/নিজেদের ভাষায় । লিখছেন আরো অনেকে । ছবি আঁকছেন । বিভিন্নভাবে দাপুটে ভাষার ভিত্তি নাড়িয়ে দিচ্ছেন । যাঁদের আমি হয়ত চিনি না । জানি না । কিন্তু জানি আমি, প্রতিরোধ হচ্ছে । এই প্রতিরোধ আরো আরো জোরালো হোক । আমাদের দরকার নতুন অভিধান । যা আমাদের পথ দেখাবে নতুন অর্থনির্মাণের । আমি জানি না, এই শব্দগুলোর পালটা শব্দ দরকার নাকি শব্দগুলোর অর্থ বদলে দেয়া দরকার । জানি না সংস্কৃতির সাথে এই পরিবর্তনের সম্পর্কটা কেমন দাঁড়াবে । আসলে ঠেকে ঠেকে আমাদের শিখতে হবে । যেক্ষেত্রে যেটা ভালো মনে হয়, সবার সম্মতি নিয়ে সেটা করাই দরকার । এই কাজে বিশেষজ্ঞ মতামত নয়, অনেক অনেক মানুষের গণতান্ত্রিক ঐকমত্য দরকার । সম্প্রতি বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের ওপর ভয়ঙ্করভাবে নেমে এসেছে নিষেধের বেড়াজাল । শোনা যাচ্ছে, দেশের তরুণ লেখকরা প্রমিত বাংলাকে অস্বীকার করে লিখে যাচ্ছেন নিজেদের আত্মপরিচয়ের সাথে জড়িয়ে থাকার দাবিসম্বলিত এক ভাষায় । মানুষের মুখে মুখে যে ভাষা পুষ্টি পেয়েছে সেই ভাষাকেই তাঁরা সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন । ভয়ঙ্কর কথা হলো, বাংলা একাডেমী নাকি আইন করবে । তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ক্রিয়াপদ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করেন, তাদের এবার রাষ্ট্রীয় শাসনের বেড়াজালে বন্দি করা হবে । আধুনিক নিও-লিবারাল যুগে এর নামই তো আইনের শাসন! ভাষার দাবি যে জাতির জাতিগত মুক্তির প্রশ্নকে সামনে এনেছিল, সেই জাতি বাংলাদেশ নামে একটি জাতিরাষ্ট্র বানিয়ে সেখানে স্বাধীনভাবে সৃজনশীল বাংলা ভাষা চর্চাকে ঠেকাতে আইন বানাচ্ছে আজ । এই ইতিহাসটুকু টুকে না রাখলে জাতিরাষ্ট্র আর এই যুগের ক্ষমতাশক্তিকে চিনে নিতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে । সে অন্য কথা । এদের কথা বললাম এই কারণে যে, ভাষার আধিপত্য শুধু পুরুষতান্ত্রিক নয় কিন্তু, শ্রেণিগতও বটে । তুচ্ছ অর্থে তুই, সম্মান অর্থে আপনি, প্রভু অর্থে স্যার । গালি অর্থে ছোটলোক! ভাষায় পুরুষতান্ত্রিকতার মতো করেই ছড়িয়ে আছে শ্রেণিগত আধিপত্য, ভাষার পরতে পরতে । আছে অঞ্চলগত আধিপত্য । উপনিবেশের ইংরেজি । আমাদের পরিসরে ঢাকাইয়া (এই ঢাকাইয়া ঢাকার সেই আদিভাষা নয়, যাইতাছি, খাইতাছি এই ভাষা) আধিপত্যও দেখা যায় প্রবলভাবে । ঢাকার নির্মিত শ্রেষ্ঠত্ব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে, বিশেষত মধ্যবিত্তকে ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলতে তাড়িত করে । আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা ভয়ঙ্করভাবে খেয়াল করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, ঢাকার কিংবা কেন্দ্রের, কিংবা রাজধানীর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাই এই ভাষিক-প্রক্রিয়ার আদি ।

সমস্ত আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেসব আলাদা লড়াই জারি আছে, তা জোরালো হোক । কোথাও না কোথাও এসে ভাষিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সামগ্রিক আন্দোলন একটি মিলনবিন্দুতে পৌঁছাবে । সেটাই কি হবে মুক্তভাষা! নোয়াম চমস্কির ওপর ভর করে বলি, প্রতিটি মানুষ অসীম সংখ্যক নতুন নতুন বাক্য তৈরিতে সক্ষম । ভাষা মানুষের আচরণের অন্তর্গত নয় বরং তা মানুষের সহজাত সক্ষমতা, তার অন্তর্জাত । চমস্কি মানবসত্তার একেবারে শাঁসের ভিতরে জারি থাকা ভাষা-ক্ষমতার ওপরে ভর করে বের করেছেন বাক্যের ডীপ স্ট্রাকচার, অনুমান সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই স্ট্রাকচার এক । এখান থেকেই সম্ভাবনা তৈরি হয় মনুষ্য-ভাষার একেবারে অভিন্ন সূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলা । প্রাচ্যে আছেন আমাদের কলিম

খান। বাক্য নয়, চমস্কিকে সাথে নিয়েই উনি চলে গেছেন আরো দূরে। খুঁজে বের করেছেন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি। শব্দের বৈচিত্র্যময় অর্থ, আর প্রতীকের সাথে সেই অর্থের সম্পর্কসূত্র। এঁরা সবাই নতুন ভাষা নির্মাণে আমাদের সাথে থাকবেন। সাথে থাকবে ঔপনিবেশিকতা-মুক্ত, শ্রেণিগত-আধিপত্যমুক্ত ভাষার দাবিতে যাঁরা লড়াইয়ে আছেন সেই তাঁরাও। চমস্কি ভাষাকে সম্পৃক্ত করেছেন মানবীয়তার সাথে। যাবতীয় কেন্দ্রীভূত আধিপত্যের বাইরে এসে ভাষা মানবীয়তার গান করুক। লৈঙ্গিক-আধিপত্যসহ যাবতীয় আধিপত্যের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভাষা যথার্থই হয়ে উঠুক স্বাধীন! নৃবিজ্ঞান থেকে কবিতা পর্যন্ত সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইশারা দিচ্ছেন নারীরা, আশাবাদ তাই দৃঢ় হতে থাকে!

বাধন অধিকারী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। badhan_adhikari@yahoo.com।

টীকাভাষ্য

১. সমস্ত শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানকে ব্যবহার করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের আভিধানিক কর্তৃপক্ষ হলো বাংলা একাডেমী। তাই অর্থ-সংস্কৃতি যাবতীয় বিবেচনায় এই অভিধানই একমাত্র বিবেচ্য হয়েছে।

২. যাঁদের হুবহু কবিতাগুলো ফেসবুক থেকে তুলে দিয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধুজন। কিন্তু আলাদা করে এই লেখায় তাঁদের কবিতা ব্যবহার করার জন্য কোনো অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করি নি, যদিও হুবহু তাঁদের কবিতাগুলো উদ্ধৃত করেছি আমি। মুখচ্ছবি থেকে (ফেইসবুক শব্দের আপাতত এমন বাংলা করেছি আমি, তবে সন্তুষ্ট হতে পারি নি, বন্ধুদের কাছে আহ্বান থাকল এর থেকে ভালো কোনো বাংলা পরিভাষা মাথায় আসলে সেটা আমায় জানাতে) কবিতাগুলো নিয়েছি, প্রত্যেকটা কবিতায় আমাকে ট্যাগ করা ছিল সম্ভবত, না থাকলেও ক্ষতি নেই। মুখচ্ছবি আদতে কপিলেফট!

৩. আমি নিজে পুরুষ (সামাজিক অর্থে) এবং পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজ করি। নিজে এমন প্রবন্ধ লিখছি বলে আমার ভাষা যে পুরুষাধিপত্য থেকে পুরোপুরি মুক্ত এমন দাবি আমি কখনো করছি না বরং আমার ভাষায় বিরাজিত পুরুষতন্ত্রকে আমি আমলে নিতে চাই, অতিক্রম করতে চাই। সেই বিবেচনায় এই প্রবন্ধ পড়েও কারো কাছে কোথাও যদি পুরুষাধিপত্যের চিহ্ন দৃশ্যমান হয় তাহলে সেটা দেখিয়ে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।